ঔপনিবেশিক আধুনিকতা বাংলায় ধাত্রীবৃত্তি

১৮৬০-১৯৪৭

অম্বলিকা গুহ

অনুবাদ
শিবলী নোমান

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আমার মা-বাবার প্রতি

অনুবাদকের উৎসর্গ

যাঁরা উপনিবেশকে বুঝতে চান, তাঁদের প্রতি

ঔপনিবেশিক আধুনিকতা

ঔপনিবেশিক ভারতে জন্মদানের চিকিৎসায়নের বিষয়টি এতকাল পর্যন্ত তিনটি প্রধান বিষয় দ্বারা চিহ্নিত হয়ে এসেছে : জন্মদান চর্চার এলাকার সংস্কার বা 'নির্বিষকরণ'-এর প্রচেষ্টাসমূহ, লাইং-ইন হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসকদের দ্বারা জন্মদানকালের ঐতিহ্যগত পরিচর্যা পদ্ধতিগুলোর প্রতিস্থাপন।

Routledge-এর The Social History of Health and Medicine in South Asia সিরিজের অংশ হিসেবে এই বই জন্মদান ও ধাত্রীবৃত্তির চর্চাসমূহ এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতাসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় দৃষ্টি দেয়। পূর্ব ভারতকে একটি কেস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করে ও অন্যান্য এলাকার সম্পর্কিত গবেষণার আলোকে, স্থানীয় সরকারি সংস্থা, মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ও জেলা বোর্ডসমূহের নিরেট গবেষণামূলক তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রথাগত আখ্যানের সীমানা পেরিয়ে এটি দেখায় যে উনিশ শতকের শেষদিকে জন্মদানবিষয়ক চর্চাগুলোর সংস্কার উদ্যোগগুলো কীভাবে মূলত ছিল ভারতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণবিধির ঔপনিবেশিক সমালোচনার বিপরীতে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত উপনিবেশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি আধুনিকতাবাদী সাড়া প্রদান। ধাত্রীবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কীভাবে নারীদের প্রশ্ন, জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতিমালাবিষয়ক বিতর্কের দ্বারা আকার পেয়েছিল, যার সবই (দুই বিশ্ব) যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে একে অপরকে ছেদ করে, সে বিষয়েও এটি প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। এই গবেষণা জন্মদানের চিকিৎসায়নের সূচনা, ধাত্রীবিদ্যার পেশাদারীকরণ, পুরুষ চিকিৎসকদের কর্তৃত্ব, মেডিকেল কলেজসমূহে একটি বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসেবে ধাত্রীবৃত্তির অন্তর্ভুক্তি এবং মাতৃত্বকালীন সেবা ও শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের ফলাফলসমূহ খুঁজে পেতে চায়।

এই বইটি ইতিহাস, সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা, জন-নীতিমালা, জেন্ডার-বিষয়ক অধ্যয়ন ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অধ্যয়নের পণ্ডিত ও গবেষকদের দারুণভাবে সহায়তা করবে।

মুখবন্ধ

ঔপনিবেশিক ভারতে শিশুজন্মের চিকিৎসায়নকে ঐতিহাসিকভাবেই জন্মদান চর্চার প্রধানতম এলাকা হিসেবে জেনানাকে (সম্মানিত গৃহস্থে নারীদের থাকার জন্য নির্জন এলাকা) 'নির্বিষ' করার এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারী চিকিৎসকদের দ্বারা দাইদেরকে (ঐতিহাসিকভাবে জন্মদানকালে পরিচর্যাকারী) প্রতিস্থাপনের একটি চেষ্টা হিসেবে মনে করা হতো। এই বইটি এই বিষয়টিতে আরো বেশি বিস্তৃতভাবে দৃষ্টিপাত করেছে, তবে এটি করতে গিয়ে গবেষণার ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে বাংলার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটি বলতে চায় যে বাংলায় শিশুজন্মের চিকিৎসায়নের পূর্ববর্তী ঘটনারূপে একটি বিদ্যায়তনিক বিষয় ও চিকিৎসাশাস্ত্র হিসেবে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবৃত্তির পুনর্গঠন ঘটেছিল। এর ফলাফল ছিল গবেষণা, অস্ত্রোপচারমূলক হস্তক্ষেপ ও নারীদের শরীরের ওপর 'নজরদারি'তে গুরুত্ব দেওয়া পেশাদারিকৃত ধাত্রীবিদ্যার ধীরগতির উত্থান। এই অধ্যয়ন আরো দেখায়, উনিশ শতকের শেষদিকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে কীভাবে শিশুজন্মের চিকিৎসায়ন মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সংস্কারবাদী ও জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সসমূহ দ্বারা টেকসই হয়েছিল ও বেড়ে উঠেছিল।

এই অধ্যয়নের শুরু হয়েছে ১৮৬০-এর দশক থেকে যখন *বামাবোধিনী পত্রিকার* মতো বাংলা ভাষার নারীদের ম্যাগাজিনসমূহে শিশুজন্ম ও গর্ভধারণ বিষয়ে প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হতে শুরু করে। আর এটি শেষ হয় ১৯৪০-এর দশকে, যখন জাতীয়তাবাদ গভীরভাবে ধাত্রীবিদ্যার পেশাদারীকরণকে প্রভাবিত করে–যে সময় ধাত্রীবৃত্তিকে জাতির প্রগতির পথে প্রধান ভিত্তি মনে করা হতো।

ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা উপবিষ্ট হওয়ার প্রথম দিকের এলাকা হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তার সাথেও প্রথম যোগসূত্র বাংলারই স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পশ্চিমা চিকিৎসা ধারার সাথে সাথে সবচেয়ে বিস্তৃত চিকিৎসা স্থাপনাও এখানেই ছিল। বিদ্যমান সাহিত্যে এটি বলা হয় যে পশ্চিমে পেশাদারিকৃত ধাত্রীবিদ্যাকে মূলত একটি পুরুষদের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, বাংলায় ধাত্রীবিদ্যার ক্রমবর্ধমান পেশাদার এলাকাটি ছিল শুধু নারী চিকিৎসকদের কর্তৃত্বের অধীনে। এই অবস্থানকে প্রশ্ন করে এই গবেষণা দেখায় যে ১৮৮০-এর দশক থেকে বাংলায় ধাত্রীবৃত্তির এলাকা নারী ও পুরুষ চিকিৎসক উভয়ের ভেতরই বণ্টিত ছিল; যদিও পুরুষদের

ভূমিকা ছিল সরাসরি হস্তক্ষেপমূলকের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত ও আদর্শিক। ঔপনিবেশিক বাংলায় জন্মদানের একটি নতুন চিকিৎসা ডিসকোর্সের বিবর্তনে তারা একসাথেই অবদান রেখেছিল।

এই গবেষণা দেখায় যে জন্মদান চর্চা সংস্কারের জন্য উনিশ শতকের শেষদিকের উদ্যোগগুলো কীভাবে মূলত ছিল ভারতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণবিধির ঔপনিবেশিক সমালোচনার বিপরীতে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত উপনিবেশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক আধুনিকতাবাদী সাড়া প্রদান; বাঙালি নারীদের 'নিম্ন' অবস্থানও যে সমালোচনার এক স্পষ্ট দোহাই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধাত্রীবৃত্তির সংস্কার মা হিসেবে মধ্যবিত্ত নারীদের আধুনিকায়িত করার অন্যতম একটি পন্থা গঠন করেছিল। বিশ শতকে চিকিৎসায়নের পক্ষের বক্তব্যটি জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিবার ও স্বাস্থ্যের প্রতি জাতীয়তাবাদী স্বীকৃতি দ্বারাও চালিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক আন্দোলনসমূহ থেকেও এটি শক্তি পেয়েছিল, যেমন জাতীয় উন্নয়নে 'জাতিগত পুনর্গঠন'-এর কেন্দ্রীয়তা বিষয়ে বৈশ্বিক সুপ্রজনন-সংক্রান্ত ডিসকোর্স এবং যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে ইংল্যান্ড ও অন্যত্র সংঘটিত মাতৃ ও শিশুকল্যাণ আন্দোলন। ধাত্রীবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কীভাবে নারীদের প্রশ্ন, জাতীয়তাবাদ ও ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতিমালা দ্বারা আকার পেয়েছিল, যার সবগুলোই যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে বাংলায় একে অপরকে ছেদ করেছিল, সে বিষয়ে এই গবেষণা একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হাজির করে।

এই গবেষণায় কতিপয় বাংলা ভাষার নারীদের ম্যাগাজিন, স্বাস্থ্যবিষয়ক জনপ্রিয় ম্যাগাজিন এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পেশাদার চিকিৎসা জার্নালসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, যেসবে জন্মদানের চিকিৎসায়ন এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে জাতীয়তাবাদী ও দাপ্তরিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই উঠে আসত। ধাত্রীবৃত্তির চিকিৎসায়নের ইতিহাস অঙ্কনের জন্য এটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো ব্যবহার করেছে এবং *ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস* ও *ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়ার* আর্কাইভকৃত সূত্রসমূহের সহায়তা নিয়েছে, যার অন্যতম হলো চিকিৎসা ও শিক্ষাগত কার্যবিবরণীসমূহ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটির ভিত্তি হলো নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলিংটনে করা আমার ডক্টরাল গবেষণা। এই বইটি লেখার পথপরিক্রমায় আমি অনেকের কাছে ঋণী হয়েছি। স্থায়ীভাবে উৎসাহ প্রদান ও সমর্থনের জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শার্লট ম্যাকডোনান্ডের প্রতি থাকবে আমার সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা। আমার অধ্যায়গুলোর খসড়ার ওপর তাদের প্রত্যক্ষ মন্তব্য ও যত্নবান সংশোধনী আমাকে আমার মনোযোগ বৃদ্ধিতে ও একে একটি তুলনামূলক ভালো আকার দিতে সাহায্য করেছে। ইতিহাস প্রোগ্রামের অন্যান্য শিক্ষকের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমার গবেষণা চলাকালীন দুটি সেমিনার উপস্থাপনায় আমার কাজের ওপর ক্রিটিক্যাল মন্তব্য করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক সেমিনারে গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য আমি ডক্টর স্টিভ বেহরেন্ট ও ডক্টর গিয়াকোমো লিচনারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমি যখন গবেষণার কাজে ভারতে ছিলাম, সেই সময়েও আমার সবচেয়ে তুচ্ছ জিজ্ঞাসাগুলোতেও দ্রুত সাড়া প্রদান ও অক্লান্ত সমর্থনের জন্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক জাস্টিন কারগিলের প্রতি ঋণস্বীকার করছি।

আমার ভেতর ইতিহাসের প্রতি স্থায়ী ভালোবাসাকে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করানোর জন্য কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষক অধ্যাপক রজত কান্ত রায় ও সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তীর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঔষধের ইতিহাসের প্রতি আমার আগ্রহের জন্য আমি ডক্টর রাজশেখর বসুর সাথে আমার অর্থপূর্ণ আলোচনাগুলোর কাছে ঋণী, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ও মেন্টর ছিলেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যের সাথে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি দারুণভাবে ঋণী ডক্টর অরবিন্দ সামন্তর প্রতি, যিনি আমাকে নারীদের প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপক হরি এস. ভাসুদেবা, অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমিত দে, অধ্যাপক সুপর্ণা গুপ্ত ও ডক্টর সংযুক্ত দাসগুপ্তের পাণ্ডিত্য থেকে আমি ব্যাপকভাবে অর্জন করেছি, যাঁরা আমাকে অগণিত উপায়ে প্রভাবিত করেছেন। কলকাতার ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রয়াত ডক্টর কৃষ্ণ সোমান আমার সাথে তাঁর গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ করেছিলেন

এবং আমার প্রস্তাব পড়ে দেখার বিড়ম্বনা গ্রহণ করে তাতে মূল্যবান ভাবনা যোগ করেছিলেন। আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই ডক্টর সুপ্রিয়া গুহের প্রতিও, সামনাসামনি কখনো যোগাযোগ না হলেও যিনি সদয়ভাবে আমার গবেষণা প্রস্তাব পড়তে ও তা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়েছিলেন।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্টারবারির ডক্টর জেন বাকিংহামের উদ্যম ব্যতিরেকে এই বই কখনোই সম্ভব হতো না, তিনি শুধু আমার পরীক্ষকই ছিলেন না, বরং আমার বন্ধু ও অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছিলেন। জেনের দেওয়া সাহসই আমাকে একটি বই লেখার চ্যালেঞ্জিং কাজের সম্মুখীন হতে উৎসাহ দিয়েছিল। তাঁর ক্রিটিক্যাল ভাবনা ও দারুণ মূল্যবান মন্তব্যসমূহ আমাকে আমার বিষয়ের সাথে আরো সূক্ষ্ম বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। বিষয়টি নিয়ে কাজ করার আরো অনেক চিন্তা-উদ্রেককারী পন্থা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি আমার আরেক পরীক্ষক অধ্যাপক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছেও ঋণী।

অধ্যাপক বিশ্বময় পতির সংস্পর্শে আসতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যিনি আমার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাপক পতির অনুপ্রেরণা ও অত্যন্ত সাবলীলতার সাথে আমার বিরামহীন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানে দ্রুততা আমাকে শুধু অবাকই করেনি, বরং বই লেখার কাজটিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহপূর্ণভাবে আমার ভেতর আত্মবিশ্বাস প্রবিষ্ট করেছিল।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অধ্যাপক তানিকা সরকারকে, যিনি ক্রাইস্টচার্চে অনুষ্ঠিত ২১তম নিউজিল্যান্ড এশিয়া কনফারেন্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কর্মশালায়, যেখানে আমি অংশ নিয়েছিলাম, আমার একটি অধ্যায় পড়েছিলেন এবং অর্থপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আমার গবেষণার প্রাথমিক বছরগুলো কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির কর্মীদের উদার সহায়তা ছাড়া অসম্ভব হতো, যাঁরা আমাকে বিরল ও সহজে বিনষ্ট হতে পারে, এমন নথি ব্যবহারে সহায়তা করেছিলেন। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল উনিশ শতকের চিকিৎসা জার্নাল ও প্রজননবিষয়ক প্যামফ্লেটসমূহ। সহজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমন বই ও জার্নালের ছবি তুলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আলাদাভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই অসীম মুখার্জি, সুনিতা অরোরা ও উত্তম মালাকারকে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির সম্প্রসারিত ভবনের কর্মীরা আমাকে সর্বাপেক্ষা কম সময়ের ভেতর প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ফটোকপি পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সমর্থন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ লাইব্রেরিতে গবেষণাকর্মকে এক আনন্দময় অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছিল।

ধন্যবাদ প্রাপ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভসের বিদিশা চক্রবর্তী ও মাধুরী বণিকের, যাঁরা আমার গবেষণার সাথে সম্পর্কিত উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি পেতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন এবং নতুন নথির বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছিলেন। সময়োপযোগী সমর্থন ও সাহায্যের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্য ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লির দ্য নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড

লাইব্রেরি এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন'স কনফারেন্সের মার্গারেট কাজিনস লাইব্রেরির কর্মীদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বাপেক্ষা কম সময়ের ভেতর তাদের দারুণ আর্কাইভের সাহায্য নেওয়ার ও মূল্যবান নথিপত্রের ফটোকপি সরবরাহ করে আমাকে উদারভাবে সুযোগ দেওয়ার জন্য কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের (সিএসএসএসসি) আর্কাইভিস্ট ও আমার বন্ধু কমলিকা মুখার্জিকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো ভাষা আমার কাছে নেই।

নিউজিল্যান্ডে আমার বন্ধুদের বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্গ, বিশেষত বেন কিংবারি ও সাব্বাক আহমেদকে, আমি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছি। শুভশ্রী ঘোষ, বিদিশা দাসগুপ্ত, রত্নবীর গুহ ও অম্বুজ ঠাকুরের মতো বন্ধু পাওয়ায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, যারা আমার অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস হিসেবে থেকেছে সব সময়।

ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু ইশিতার, যার স্নেহ ও যত্ন ওয়েলিংটনে আমার কাটানো প্রতিটি মুহূর্তকে করেছে স্মরণীয়।

আমার পিতা-মাতা আমার শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস। আমি যে সব সময়ে এই কাজটি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাচ্ছিলাম, তখন মা আমাকে কাজটি চালিয়ে নিতে প্রেরণা জোগাতেন। আর বাবা ছিলেন আমার খুঁটি।

অভীকের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা, আমাকে এমন গবেষণা করতে দেওয়ার জন্য, যার কারণে প্রায়ই তার থেকে আমার পরোক্ষভাবে আলাদা থাকতে হতো। ইতিহাসের প্রতি তার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল ও ভালোবাসা সবচেয়ে নিরানন্দ সময়গুলোতে আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমাকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃঢ়তা দিয়েছে।

(অম্বলিকা গুহ)

অনুবাদকের বয়ান

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চলমান রেটরিককে যদি হিসাবে ধরা হয়, তাহলে পাকিস্তান আমলসহ আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার ইতিহাস প্রায় ২১৪ বছরের। আর একে যদি অতিরঞ্জন মনে করার ঝুঁকি থাকে, তাহলে শুধু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় ১৯০ বছরের কথা বলা হলে এ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক হবে না আশা করি। দিন শেষে আমি মনে করি, উপনিবেশ বিষয়টি একটি পশ্চিমা প্রকল্প বা বিষয় হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্ট বা চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাগুলোর ভেতর পার্থক্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য মূলত উপনিবেশকে শোষণ করে, উপনিবেশের সম্পদ রীতিবদ্ধভাবে চুরি ও পাচার করে ইয়োরোপের ফুলেফেঁপে ওঠার ধ্রুব বৈশিষ্ট্যে নয়, বরং এই শোষণ ও রীতির ধরনে।

এ কারণেই হয়তো ফ্রাঞ্জ ফানোঁ যেখানে আফ্রিকার উপনিবেশের ইতিহাস ও চর্চা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বি-উপনিবেশায়নকে একটি নিশ্চিত সহিংস বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন (যদিও তিনিই এর আগে একধরনের মানবিক বি-উপনিবেশায়নের কথাও বলেছিলেন) কিংবা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে অহিংস রাজনীতি ও আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন, সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক চর্চা বা বি-উপনিবেশায়ন ভাবনার সাথে তার পার্থক্য চোখে পড়ে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকে মনে হয়, এই তিনটি অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো উপনিবেশ চালিয়ে নেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা পন্থা গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় পা রেখেই তারা একতরফা হত্যাকে বেছে নেয়, আফ্রিকাকে নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিয়েছিল বার্লিন কনফারেন্সের মাধ্যমে, আর ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাস শুরু হয় কোম্পানির অদ্ভুত শাসনের ভেতর দিয়ে। এ ক্ষেত্রে কোম্পানিকে দায়মুক্তি দিতে চাওয়া পণ্ডিতগণ বলতে চান যে ভারতে শাসনকার্য নিজ হাতে তুলে নেওয়ার প্রশ্নে ইংল্যান্ডে বসে থাকা কোম্পানির কর্তারা ভিন্নমত পোষণ করতেন। সে ভিন্ন আলাপ!

আবার ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পার্থক্য চোখে পড়ে। এর ভেতর মোটাদাগে দুটি ধরন হলো, মূলত জাতীয়তাবাদী বা আঞ্চলিকতাবাদী যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিলাভ এবং আরেকটি হলো আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জন। এই পার্থক্যের কারণও সম্ভবত উপনিবেশ থেকে উপনিবেশে শোষণের ধরন, মাত্রা ও ব্যাপ্তির ব্যবধান। এ ক্ষেত্রে এটি নিয়ে বিতর্ক

হতে পারে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হতে পারে ভারতে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাস অন্যান্য উপনিবেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নমনীয় ধরনের ছিল, যেখানে ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় জনগণকে সুকৌশলে বিভক্ত করেছে এবং কোনো কোনো অংশকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা ধরে রাখতে চেয়েছে। তা ছাড়া এই উপনিবেশকালে তারা যেসব প্রাযুক্তিক উন্নয়ন এই অঞ্চলে করেছে, তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রধানত উপনিবেশের স্বার্থ তথা শোষণ ও সম্পদ পাচার জারি রাখা এবং দ্বিতীয়ত, প্রথম লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ইয়োরোপীয় জনগণের নিরাপত্তা বিধান। এ জন্যই হয়তো লর্ড ডালহৌসি রেল, ডাক ও টেলিগ্রাফ সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আর পার্থ পঞ্চাধ্যায়ী দেখিয়েছেন রেললাইন নির্মাণের জন্য খুঁড়ে রাখা মাটিতে পানি জমে জমে কীভাবে ম্যালেরিয়ার মতো রোগ ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে তাই বলতে হয়, উন্নয়ন খুবই আপেক্ষিক বিষয়, সমাজের সকল অংশকে এর সাথে জুড়ে নিতে না পারলে তথাকথিত উন্নয়ন কতিপয়ের উন্নয়ন হয়ে থেকে যায়; আর এই কতিপয়ের উন্নয়নই উপনিবেশগুলোর বাস্তবতা।

২০১৮ সালে প্রকাশিত অম্বলিকা গুহের এই বইটি মূলত দেখাতে চেয়েছে যে বাংলায় ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ভেতর ধাত্রীবৃত্তি কীভাবে প্রচলিত দাইদের থেকে সরে গিয়ে পেশাদার ধাত্রী ও চিকিৎসকদের আধিপত্যপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছিল। উপনিবেশ নিয়ে আমাদের বহুল প্রচলিত ডিসকোর্সগুলোর ভেতর এই বিষয় নিয়ে আলাপ সাধারণত হয় না। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এই গবেষণামূলক কাজটি থেকে দেখা যাবে যে আমরা আমাদের যাবতীয় আধুনিকতার জন্য প্রায়শই ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি ঋণস্বীকার করে থাকলেও আদতে তারা এই অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে কমই ভেবেছে। এই সময়কালে বাংলায় ধাত্রীবৃত্তির ইতিহাস থেকে দেখা যাবে যে এ সময় মূল কাজগুলো স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছিল, সরকারি উদ্যোগ খুব বেশি ছিল না। অর্থাৎ নীতিগত পর্যায়ে উপনিবেশের জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার বিষয়টি অনেকটাই অনুপস্থিত ছিল। তা ছাড়া যেটুকু পরিবর্তন এসেছিল তার অনেকাংশই ছিল ইংল্যান্ডের অনুকরণ, সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোকে একধরনের বাতিল বা তামাদি হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বাংলার শহরাঞ্চলগুলোতেই এই চিকিৎসাগত পরিবর্তনগুলো চলমান ছিল, সে ক্ষেত্রে প্রান্তিক ও গ্রামাঞ্চলগুলো এসবের বাইরেই থেকে যায়। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসকেরা খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের নিয়েই ভেবেছে ও সেখানেই অর্থ সরবরাহ করেছে, যা নিয়ে না ভাবলে ও যেখানে অর্থ সরবরাহ না করলে তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ বাধাগ্রস্ত হয়।

তা ছাড়া ঔপনিবেশিক সময়ে উপনিবেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে স্থানীয় মধ্যবিত্তদের ভদ্রলোকে পরিণত হওয়া ও নিজেদের নতুন পরিচয় নির্মাণে ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাকে কাজে লাগানোর মানসিকতা কীভাবে বাংলায় ধাত্রীবৃত্তির

বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছিল, তারও সামাজিক আখ্যান এই বই থেকে পাওয়া যায়। নিজেদের উপনিবেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করার যে আপ্রাণ চেষ্টা সে সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্তদের ভেতর চলমান ছিল, তারই দৃষ্টান্ত দেখা যাবে সে সময়ের সংবাদপত্র, জার্নাল ও ম্যাগাজিনগুলোতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের আধুনিকতার পক্ষে ওকালতি ও পক্ষপাতিত্বের মুখ্য বয়ান থেকে, তবে এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। দিন শেষে আমাদের যে বিষয়টি ভাবা জরুরি তা হলো, স্থানীয় ঐতিহ্যকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা গ্রহণই কি আমাদের একমাত্র বিকল্প ছিল, নাকি দুইয়ের মিশ্রণে উপনিবেশিত জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবা যেত? যদি পরের বিষয়টি সত্য হয়, তাহলে ঔপনিবেশিক সময়ে আমাদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া কি জরুরি নয়?

দুঃখজনক বিষয় হলো, উপনিবেশ থেকে তথাকথিত মুক্তির প্রায় ৭৫ বছর পরও ঔপনিবেশিক আধুনিকতাগুলোর আলোকেই আমরা এখনো নিজেদের আধুনিক প্রমাণের চেষ্টায় মত্ত রয়েছি। আর এর ফলাফল হিসেবে উপনিবেশ থেকে মুক্তির পরও এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার খুব দৃষ্টিকটুভাবে চলমান থেকেছে কিংবা এখনো আছে। কীভাবে চলমান থেকেছে বা আছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের স্বাস্থ্য খাতের সেই ধারাতেই চলতে থাকা, যার সাথে ঔপনিবেশিক ধারার মিল কোথাও না কোথাও কিংবা খুব স্পষ্টভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়।

২.

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে একটি ভালো অনুবাদ প্রতিটি ভাষাতেই নতুন কিছু সংযোজন করে। জানি না এই অনুবাদটি আদৌ ভালো কিছু হয়েছে কি না, আর হলেও বাংলা ভাষায় নতুন কিছু সংযোজন করবে কি না। তবে এ ক্ষেত্রে এটি বলে রাখা যেতে পারে যে একাডেমিক আদলে লেখা এই বইয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলানুগ থাকার জন্য ও প্রকৃত লেখার আস্বাদ ধরে রাখার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদে দীর্ঘ বাক্য রেখে দেওয়া হয়েছে, যা বাংলা ভাষার খুব একটা প্রচলিত চর্চা নয়। তবে এই পন্থা অবলম্বন নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে, কারণ, এটি একান্তই অনুবাদকের ভাবনাপ্রসূত।

অন্যদিকে বইয়ের বিষয়ের কারণে এই বই আদৌ পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। তবে উপনিবেশকে বুঝতে হলে, ঔপনিবেশিক শাসন ও নীতিমালার ভেতর-বাহির বুঝতে হলে এই-জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থের সাথে পরিচয় ও বোঝাপড়া থাকাটা খুব একটা খারাপ হবে না বলেই মনে হয়। কারণ, উপনিবেশের সাথে বোঝাপড়াটা সঠিক না হলে, আমাদের জীবনাচরণে উপনিবেশের উত্তরাধিকারের সীমানা নির্ণয় করতে না পারলে, আমরাই অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য থেকে যেতে ও পরিচয়সংকটে পড়তে বাধ্য হব, নিজের অজান্তে হলেও।

৩.

এই বইটির অনুবাদ প্রকাশের পেছনে কিছু মানুষের সহায়তা অপরিহার্য ছিল। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয়।

প্রথমেই বলতে হবে নাহিদ হাসান ভাইয়ের কথা। উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক ইতিহাস প্রচারের যে উদ্যোগ তিনি হাতে নিয়েছিলেন, তার অংশ হতে পারার ইচ্ছা থেকে অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশের সাথে সাথে তিনি এই বইটি আমাকে অনুবাদের জন্য দিয়েছিলেন।

দেবজ্যোতি ঘোষকে একপ্রকার বাধ্য করেছি অনুবাদের বিভিন্ন অংশের বানান প্রাথমিকভাবে দেখে দেওয়ার জন্য। দেবজ্যোতির সাথে সাথে মুরাদ হোসেন ও স্বাধীন ইসলাম অনুবাদের বিভিন্ন অংশ পড়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে পাশে থেকেছে। পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা চাওয়ামাত্রই বরাবরের মতো এগিয়ে এসেছেন প্রিয় শিক্ষক মামুন অর রশীদ। আর বলামাত্রই যত্নসহকারে পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দেওয়া ও সম্পাদনার কাজটি করে দিয়েছে বন্ধু মিজান টিটু। অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করা ছাড়াও অনুবাদের বিষয়টি জানানোর সাথে সাথে নিজের সম্পাদিত ওয়েব ম্যাগাজিন সহজিয়াতে অনুবাদটি কিস্তি আকারে প্রকাশ শুরু করে নতুন করে কৃতজ্ঞ করেছেন আরেকজন পছন্দের মানুষ অধ্যাপক সুমন সাজ্জাদ। বন্ধু, সহকর্মী সাঈদ অভি ও প্রিয়ভাজন নীরব মাহমুদ বিভিন্ন সময় অনুবাদের অগ্রগতি জানতে চেয়েছে। অনুবাদের একটি পর্যায়ে বলামাত্রই সাহায্য করেছে প্রিয় সূচনা তৃষা। চিকিৎসাবিদ্যা ও ধাত্রীবৃত্তি আমার খুব একটা পূর্বপরিচিত এলাকা না হওয়ায় বইটি অনুবাদ করার জন্য অনেক কিছু নতুন করে জানতে হয়েছে, বুঝে নিতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে পাশে থেকেছে তরুণ চিকিৎসক বন্ধু পিযুষ বিশ্বাস। কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয় বন্ধুবর বিজয়া তূর্ণার প্রতি, অধ্যায়গুলোর টীকা দেখে দেওয়ার পাশাপাশি যে সময়গুলোতে হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, তখনো পাশে থেকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য। কৃতজ্ঞতা আমার মা-বাবা-বোন ও পরিবারের অন্যদের প্রতি, যাদের জন্য আমি কিছুই করি না কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদের থেকে কিছু না কিছু নিয়েই যাচ্ছি।

আর কৃতজ্ঞতা আমার শিক্ষার্থীদের প্রতি, অনুবাদ শুরু করা নিয়ে যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে সময় কাটাচ্ছিলাম, তখন তাদের কারো কারো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই কাজটি শুরু করার আগ্রহ জাগিয়েছিল।

সবার প্রতি থাকল অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা!

শিবলী নোমান
ডিসেম্বর ২০২৪, জাহাঙ্গীরনগর।

সূচি

অ ধ্যা য় ০১

বৈজ্ঞানিক মা ও স্বাস্থ্যবান শিশু : বাংলায় একটি 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক' ডিসকোর্সের জন্ম, ১৮৬০-এর দশক থেকে ১৯০০ ৫২

অ ধ্যা য় ০২

ধাত্রীবৃত্তির শৈল্পিকতা ও বিজ্ঞান : ধাত্রীবৃত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও একটি চিকিৎসা ডিসকোর্সের গঠন, ১৮৬০-এর দশক থেকে ১৯৩০-এর দশক ৯৭

অ ধ্যা য় ০৩

মাতৃ ও শিশুকল্যাণ : ঔপনিবেশিক বাংলার শেষদিকের একটি জাতীয়তাবাদী চিন্তা, ১৯০০-১৯৪০-এর দশক ১৫১

অ ধ্যা য় ০৪

'সেবাপ্রদানকারী' : বাঙালি পাবলিক ডিসকোর্স ও চর্চায় জন্মদান-পূর্ব সেবা, ১৮৬০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশক ২০৫

উপসংহার ২৪৪

শেষ কথা ২৫১

তথ্যসূত্র ২৫৯